بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ জুন, ২০২১ মোতাবেক ২৫ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আজ আরো কিছু বলব। যায়েদ বিন আসলাম রেওয়ায়েত করেন যে, তার পিতা বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে **'হার্‌রাহ্ ওয়াকিম'** অভিমুখে যাই। এটি দুই হার্‌রার মাঝে (অবস্থিত) একটি জায়গা। কালো পাথুরে জমিকে **'হার্‌রাহ্'** বলা হয়। মদিনার পূর্বদিকে **'হার্‌রাহ্ ওয়াকিম'** অবস্থিত, যাকে হার্‌রাহ্ বনু কুরাইযাহ্ও বলা হয়। অপরটি হলো, **'হার্‌রাতুল ওয়াবরা'** যা মদিনার পশ্চিমে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, তিনি বলেন আমরা যখন **'সিরার'** নামক স্থানে পৌঁছি তখন এক জায়গায় আগুন জ্বলছিল। **'সিরার'ও** মদিনা হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আসলাম! আমার মনে হয় এরা কোন মুসাফির হবে যাদেরকে রাত ও শীত (এখানে) থামতে বাধ্য করেছে। আমার সাথে চল। অতএব আমরা দ্রুত হেঁটে তাদের কাছে পৌঁছি আর দেখি, একজন মহিলার সাথে তার কয়েকজন সন্তান রয়েছে আর একটি পাতিল চুলার ওপর রাখা আছে। তার সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় ডুকরে কাঁদছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আলোকোজ্জ্বলকারীরা! আস্সালামু আলাইকুম। তিনি আগুন ওয়ালা বলা পছন্দ করেন নি, বরং আলোকোজ্জ্বলকারী (বলেছেন)। সেই মহিলা ওয়া আলাইকুম আস্সালাম বলে। তিনি (রা.) বলেন, আমি (তোমাদের) নিকটে আসতে পারি কি? সেই মহিলা বলেন, সৎ উদ্দেশ্য থাকলে আস, নতুবা ফিরে যাও। অর্থাৎ কোন ভালো কথা বলতে চাইলে আস, নতুবা ফিরে যাও। তিনি (রা.) কাছে যান, এরপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কী হয়েছে? উত্তরে সেই মহিলা বলে, রাত এবং শীত আমাদেরকে এখানে আটকে রেখেছে। তিনি (রা.) বলেন, এই শিশুদের কী হয়েছে, এরা কেন ডুকরে কাঁদছে? সেই মহিলা বলেন, ক্ষুধার তাড়নায়। হযরত উমর (রা.) বলেন, এই পাতিলে কী আছে? সেই মহিলা বলে, এতে শুধু পানি আছে আর এর মাধ্যমে আমি বাচ্চাদের প্রবোধ দিচ্ছি, যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ আমাদের এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে মীমাংসা করবেন। তিনি (রা.) বলেন, হে মহিলা! আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন, তোমাদের অবস্থা উমর কি করে জানবেন? সে বলে, তিনি আমাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ব্যাপারে উদাসীন। হযরত উমর (রা.)'র সঙ্গী আসলাম বলেন, এরপর তিনি (রা.) আমার কাছে ফিরে আসেন আর বলেন, আমার সাথে চল। তারপর আমরা অত্যন্ত দ্রুত হেটে **'দারুল দাকীক'** পৌঁছি। হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে **'দারুল দাকীক'** নামে একটি ভবন নির্মাণ করেছিলেন। যাতে আটা, ছাতু, খেজুর, কিশমিশ এবং সফরের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, যা একজন মুসাফিরের প্রয়োজন হতে পারে, তা রাখা থাকত। তিনি (রা.) মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী পথেও মুসাফিরদের জন্য কয়েকটি সরাইখানা বানিয়ে রেখেছিলেন। যাহোক এরপর তিনি (রা.) সেখান থেকে এক বস্তা খাদ্যশস্য বের করেন এবং একটি ঘিয়ের কৌটা নেন। তিনি (রা.) বলেন, এগুলো আমার (পিঠে) তুলে দাও। আসলাম বলেন, আপনার পরিবর্তে আমি বহন করছি। হযরত উমর (রা.) দুই অথবা তিনবার বলেন, এগুলো আমার (পিঠে) তুলে দাও। প্রতিবারই আমি নিবেদন করি, আপনার স্থলে আমি বহন

করছি। অবশেষে হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার মঙ্গল হোক। কিয়ামত দিবসে আমার বোঝা কি তুমি বহন করবে? এরপর আমি সেই বস্তা তাঁর (পিঠে) তুলে দেই। এরপর তিনি (রা.) সেই বস্তা নিজের পিঠে উঠিয়ে দ্রুতগতিত হাঁটতে আরম্ভ করেন আর আমিও তাঁর সাথে দ্রুত চলতে থাকি এবং অবশেষে সেই মহিলার কাছে পৌঁছে যাই। তিনি (রা.) সেই বস্তাটি তার কাছে নামিয়ে তা থেকে কিছু আটা বের করেন এবং সেই মহিলাকে বলেন, এগুলো তুমি অল্প অল্প করে পাতিলে ঢাল আর আমি তোমার জন্য নাড়ছি। অন্যত্র লিখা আছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি ধীরে ধীরে আটা ঢাল, আমি তোমার জন্য হারীরা রান্না করে দিচ্ছি। এরপর তিনি (রা.) পাতিলের নীচে আগুন জ্বালানোর জন্য ফুঁ দিতে থাকেন। আসলাম, অর্থাৎ রেওয়ায়েতকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) দীর্ঘ ও ঘন শশ্রুধারী ছিলেন। আমি দেখি, ধোঁয়া তাঁর দাড়ির মধ্যে দিয়ে বের হচ্ছে। অর্থাৎ ধোঁয়া উঠার সময় তাঁর চেহারাতেও লাগত আর দাড়ির মধ্যেও ঢুকে যেত। রান্না শেষ হলে তিনি (রা.) পাতিলটি নীচে নামিয়ে রাখেন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, কোন পাত্র নিয়ে আসুন। সেই মহিলা বড় একটি প্লেট নিয়ে আসে। তিনি (রা.) তাতে খাবার ঢেলে দিয়ে বলেন, তুমি এই শিশুদের খাওয়াও আর আমি তোমার জন্য (খাবার ঢেলে) ছড়িয়ে রাখছি যাতে ঠাণ্ডা হয়। অর্থাৎ আরেকটি পাত্রে আরো (খাবার) ঢেলে তা ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করছি। তিনি (রা.) অনবরত (খাবার) ঢেলে ঠাণ্ডা করতে থাকেন যতক্ষণ না বাচ্চারা পেট ভরে খাবার খেয়ে নেয়। অবশিষ্ট খাবার তিনি তার কাছেই রেখে আসেন। আসলাম বলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যান আর আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যাই। তখন সেই মহিলা বলে, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এক্ষেত্রে, অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি আমীরুল মু'মিনীনের চেয়ে অধিক হকদার। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, পুণ্যের কথা বল। তুমি যখন আমীরুল মু'মিনীনের কাছে যাবে তখন তুমি আমাকে সেখানে পাবে, ইনশাআল্লাহ্। যাহোক, তিনি বলেন, এরপর হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে এক দিকে সরে গিয়ে সেই মহিলার দিকে মুখ করে বসে পড়েন। আমি তাঁর সমীপে নিবেদন করি, এছাড়াও আরো কোন কাজ আছে কি? তিনি (রা.) আমাকে এর কোন উত্তর দেন নি। এক পর্যায়ে আমি যখন দেখি, বাচ্চারা পরস্পরের সাথে খেলাধূলা করছে, হাসাহাসি করছে এবং সব শিশু শান্তিতে ঘুমিয়ে গেছে তখন হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দাঁড়ান এবং আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে আসলাম! এই শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় জেগে ছিল এবং কাঁদছিল। আমি চাইলাম যে, এখান থেকে আমি ততক্ষণ যাব না যতক্ষণ না আমি তাদের এই স্বস্তির অবস্থা দেখতে পাই যা আমি এখন দেখেছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) লিখেন,

যারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম এমন লোকদের জন্য তা সরবরাহ করা ইসলামী রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য; অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর একটি ঘটনা (হৃদয়ে) গভীর রেখাপাতকারী ও বাস্তবতা উন্মোচনকারী। একবার দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) বাইরে বের হন এটি জানার জন্য যে, কোন মুসলমানের কোন কষ্ট নেই তো? রাজধানী মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরত্বে মিরার নামক একটি গ্রাম ছিল। আমাদের গবেষকরা বলছেন, সম্ভবত এর নাম মিরার নয়, বরং সিরার। হতে পারে লিপিকারের ভুলের জন্য মিরার লিখা হয়েছে। যাহোক, সেখানে তিনি দেখেন, এক দিক থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে। সেদিকে গিয়ে দেখেন, এক মহিলা কিছু রান্না করছে আর ২-৩টি শিশু কান্না করছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী সমস্যা? সেই (মহিলা) বলে, ২-৩ বেলা শিশুরা অনাহারে আছে, কিন্তু ঘরে খাওয়ার কিছু নেই। বাচ্চারা খুবই অস্থির হয়ে গেছে, তাই খালি পাতিলই চুলায় চড়িয়ে দিয়েছি যাতে তারা প্রবোধ পেয়ে ঘুমিয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) একথা শোনামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে মদিনায় ফিরে আসেন আর

এরপর আটা, ঘি, মাংস ও খেজুর একটি বস্তায় উঠিয়ে তাঁর সেবককে বলেন, এটি আমার পিঠে তুলে দাও। সে বলে, হুযূর! আমি তো আছি, আমি নিজেই উঠিয়ে নিচ্ছি। উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এখন তুমি এটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমার বোঝা কে উঠাবে? অর্থাৎ তাদের পানাহারের খোঁজখবর রাখা আমার দায়িত্ব ছিল, আর এ দায়িত্ব পালনে আমার ত্রুটি হয়েছে তাই এর প্রায়শ্চিত্ত হলো আমি নিজে বহন করে এ সমস্ত উপকরণ নিয়ে যাব এবং তাদের ঘরে পৌঁছে দিব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, অভাবীদের যে ভাতা দেয়া হয়– এ ঘটনা থেকে কেউ যেন এ অর্থ না করে যে, আলস্য সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক অভাবীকে ভাতা দিতে হবে। তিনি (রা.) লিখেন, ইসলাম যেখানে দরিদ্রদের দেখাশোনার নির্দেশ দেয়, সেখানে যেমনটি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, অলসতা ও উদাসীনতাকেও দূর করে। ভাতা এ কারণে দেয়া হয় না যে, আলস্য এবং উদাসীনতা সৃষ্টি করা হবে। এই ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, মানুষ কাজ ছেড়ে বসে থাকবে। বরং এই ভাতা কেবল অপারগদের দেয়া হতো। অন্যথায় হাত পাতা থেকে মানুষকে বিরত করা হতো। হযরত উমর (রা.) ভিক্ষুকদের হাত পাতা থেকে বিরত রাখার জন্যও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। এটি নয় যে, ভিক্ষুক দেখলেই খাবার খাইয়ে দিতেন বা কেউ সাহায্য চাইলেই কিছু দিয়ে দিতেন, বরং ভিক্ষুক স্বাস্থ্যবান হলে তিনি (রা.) অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

একবার হযরত উমর (রা.) এক ভিক্ষুককে দেখেন যে, তার থলে আটায় পূর্ণ ছিল। সে ভিক্ষা করছিল আর তার থলেতে আটা ভর্তি ছিল। তিনি (রা.) তার কাছ থেকে আটা নিয়ে উটের সামনে দিয়ে দেন আর থলি খালি করে দিয়ে বলেন, এখন ভিক্ষা কর। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, ভিক্ষুকদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো। অর্থাৎ তুমি সুস্থসবল মানুষ, তুমি ভিক্ষা করছ কেন? পরিশ্রম কর, উপার্জন কর আর খাও। এছাড়া এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, পুনরায় ভিক্ষা করলে তোমার সাথে আবারও একই ব্যবহার করা হবে, অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পশুপাখিকে দিয়ে দেয়া হবে। যারা হাত পাতে তাদের অধিকাংশ এই একটি উদাহরণ দিয়েই এ বিষয়ের ওপর জোর দেয় যে, দেখ! হযরত উমর (রা.) কীভাবে দেখাশোনা করতেন? কিন্তু ইসলাম যে হাত পাততে বারণ করেছে তা দেখে না। এছাড়া এ বিষয়েও হযরত উমর (রা.)-এর এবং মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে আর হযরত উমর (রা.) যে তা বাস্তবায়ন করেছেন তারা সেটি দেখে না।

পুনরায় এ ঘটনাটি অন্যত্র বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত ওমরের কথা চিন্তা কর। একদিকে তাঁর প্রতাপ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে পৃথিবীর বড় বড় বাদশাহরা কাঁপত, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও প্রকম্পিত হতো। কিন্তু অন্যদিকে অন্ধকার রাতে এক বেদুইন মহিলার সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখে উমর (রা.)-এর ন্যায় মহান মর্যাদার মানুষও অস্থির হয়ে যান এবং আটার বস্তা নিজের পিঠে এবং ঘিয়ের কৌটা নিজ হাতে নিয়ে তার কাছে যান আর ততক্ষণ ফিরে আসেন নি যতক্ষণ না তিনি নিজ হাতে খাবার রান্না করে সেসব শিশুকে খাইয়েছেন এবং তারা শান্তিতে ঘুমিয়েছে।

পুনরায় হযরত উমর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস, যার উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে, সেই আসলাম বলেন, মদিনায় একটি বানিজ্য কাফেলা আসে। তারা ঈদগাহে অবস্থান নেয়। হযরত উমর (রা.) আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে বলেন, আমরা রাতের বেলা তাদেরকে পাহারা দিব– এটি কি আপনি পছন্দ করবেন? তিনি নিবেদন করেন, জ্বী হ্যাঁ। সুতরাং তারা দুজন সারারাত তাদের প্রহরা দিতে থাকেন এবং ইবাদত করতে থাকেন। হযরত উমর (রা.) এক শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে সেখানে যান এবং তার মাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ভয় কর এবং নিজ সন্তানদের ভালোভাবে দেখাশোনা কর। এটি বলে তিনি ফিরে আসেন। তিনি

পুনরায় তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। অর্থাৎ যেখানে তিনি জিনিসপত্রের প্রহরার জন্য বসেছিলেন সেখানে ফিরে এসে পুনরায় তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি আবার তার মায়ের কাছে যান এবং পুনরায় তাকে পূর্বের ন্যায় বলেন আর নিজ স্থানে ফিরে আসেন। রাতের শেষ প্রহরে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি (রা.) তার মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি অনেক উদাসীন মা। ব্যাপার কী যে, সারারাত তোমার শিশু অস্থির হয়ে কাঁদছে? সে অর্থাৎ সেই মহিলা বলে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি তাকে দুধের পরিবর্তে অন্য খাবারে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে, অর্থাৎ সেই শিশু অস্বীকার করছে আর দুধই খেতে চাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কেন? সেই মহিলা বলে, কেননা হযরত উমর (রা.) সেসব শিশুর জন্যই ভাতা নির্ধারণ করেছেন যাদের দুধ ছাড়ানো হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার এই সন্তানের বয়স কত? সেই মহিলা বলে, এত আর এত মাস। হযরত উমর বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়া করো না। এরপর বাজামা'ত ফজরের নামায পড়ানোর সময় তার কান্নার কারণে মানুষের জন্য কেরাত স্পষ্ট হচ্ছিল না। হযরত উমর নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, উমরের মন্দ হোক, সে কত মুসলমানের সন্তানকে-ই না হত্যা করে থাকবে। এরপর তিনি ঘোষককে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করে যে, তোমাদের সন্তানদের দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করো না, আমরা ইসলামে বা মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া প্রত্যেক শিশুর জন্য ভাতা নির্ধারণ করছি আর হযরত উমর সকল দেশে এই নির্দেশ জারী করেন।

এই ঘটনাটিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমর প্রথম দিকে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য কোন ভাতা নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নির্দেশ দেন যেন তাদের অংশ তাদের মায়েদের দেয়া হয়। পূর্বে হযরত উমর এটি মনে করতেন যে, যতদিন শিশু দুধ পান করে সে জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা পালন করে না। তার দায়িত্ব তার মায়ের ওপর থাকে, জনগণের ওপর নয় যে, বায়তুল মাল থেকে তার খরচ প্রদান করা হবে। কিন্তু একবার হযরত উমর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে যান। শহরের বাইরে বেদুইনদের একটি কাফেলা তাঁবু খাটিয়ে ছিল। হযরত উমর একটি তাঁবু থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। শিশুটি চিৎকার করছিল আর মা হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। বেশ কিছুক্ষণ হাত বুলানো সত্ত্বেও যখন শিশুটি চুপ করে নি তখন মা শিশুটিকে চপেটাঘাত করে বলে, উমরকে অভিশাপ দাও। হযরত উমর আশ্চর্য হন যে, এর সাথে আমার কী সম্পর্ক! হযরত উমর সেই মহিলার কাছে তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করেন আর ভিতরে প্রবেশ করে সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে ভদ্রমহিলা! কী হয়েছে? সে যেহেতু হযরত উমরকে চিনত না তাই সে বলে, কী হয়েছে যে, হযরত উমর সবার ভাতা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি কি এটি জানেন না যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুরও খাবারের প্রয়োজন হয়। আমার দুধ তার জন্য যথেষ্ঠ নয় আর আমি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি, যেন তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। হযরত উমর তখনই ফিরে আসেন এবং কোষাগার থেকে আটার বস্তা বের করান আর স্বয়ং তা কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকেন। যে ব্যক্তি কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সে এগিয়ে আসে যে, আমরা তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। হযরত উমর তাকে বলেন, তুমি ছেড়ে দাও, আমি নিজেই এটি বহন করে নিয়ে যাব। কিয়ামতের দিন আমাকে যখন চাবুকাঘাত করা হবে তখন কি আমার স্থলে তুমি উত্তর দিবে। জানি না এভাবে আমার মাধ্যমে কত শিশু মারা গেছে। এরপর হযরত উমর দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ জারি করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হাদীসে আম্মার বিন খুযায়মা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর আমার পিতাকে বলেন, তোমাকে কীসে নিজ জমিতে বৃক্ষ রোপনে বারণ করেছে? তখন আমার পিতা বলেন, (সেই ব্যক্তি আর বৃক্ষ রোপন করছিল না, নিজের বাগানকে সম্প্রসারিত করছিল না অথবা নষ্ট চারার স্থলে নতুন গাছ লাগাচ্ছিল না) আমার পিতা উত্তর দেন যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। কিছুদিনের মাঝেই মৃত্যু বরণ করব। এতে আমার কী লাভ? অতএব হযরত উমর তাকে বলেন, তোমাকে গাছ লাগাতেই হবে, (এক্ষেত্রে) কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ তোমাকে আবশ্যিকভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে। তিনি বলেন, এরপর আমি হযরত উমরকে দেখেছি যে, তিনি স্বয়ং আমার পিতার সাথে আমাদের জমিতে বৃক্ষ রোপন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটি অলসতা বর্জনের প্রেক্ষিতেও বর্ণনা করেছেন আর এ কথা বুঝিয়েছেন যে, পূর্বপুরুষের লাগানো গাছের ফল তোমরা ভোগ করছ, তাই পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও কিছু রেখে যাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) রাতের বেলা পায়চারি করতেন। এক রাতে শহরে ঘোরাফেরার সময় তিনি এক মহিলাকে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনতে পান। তিনি (রা.) দিনের বেলা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্বামী দীর্ঘদিন যাবৎ বাইরে আছে। সে সেনাবাহিনীর সাথে বাইরে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি (রা.) এই আদেশ জারি করেন যে, কোন সৈনিক যেন চার মাসের বেশি বাইরে না থাকে। যদি কোন সৈনিকের এর চেয়ে বেশি সময় বাইরে থাকতে হয় তবে সে যেন তার স্ত্রীকেও সাথে রাখে। অন্যথায় তাকে যেন সেনাকর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে বাড়িতে ফেরত পাঠায়। এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় এক স্থানে এটিও বলা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) সেই মহিলার কবিতা আবৃত্তি শুনে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কোন পাপের সংকল্প কর নি তো? সেই মহিলা উত্তরে বলে, আমি আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাচ্ছি। হযরত উমর (রা.) সেই মহিলাকে বলেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার স্বামীর নিকট আমি আজকেই পত্র প্রেরণ করছি। অতএব তিনি (রা.) তার স্বামীকে ফেরত আনতে একজন দূত প্রেরণ করেন। এরপর তিনি (রা.) এই বিষয়ে আরও খোঁজখবর নেন। আর যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) সর্বোচ্চ চার মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন, অর্থাৎ এই সময়ের বেশি যেন স্বামী বাইরে না থাকে, অন্যথায় স্ত্রী-সন্তানরা যেন সাথে থাকে।

হযরত উমর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আসলাম বলেন, একবার আমি হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মদিনার বাইরের অংশে গেলে সেখানে একটি তাঁবু দেখতে পাই। আমরা সেই তাঁবুর নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা দেখি তাঁবুতে এক ভদ্র মহিলা প্রসব বেদনায় কাঁদছে। হযরত উমর (রা.) তার খবরাখবর জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি একজন ভিনদেশি মুসাফির আর আমার কাছে কিছুই নেই। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) কেঁদে ফেলেন এবং দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি কি সেই পুণ্য অর্জন করতে চাও যার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন? তখন তিনি (রা.) তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বলেন, জ্বী, অবশ্যই। অতঃপর হযরত উমর (রা.) নিজের পিঠে আটা ও ঘি উঠান এবং হযরত উম্মে কুলসুম প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তারা উভয়ে সেখানে আসেন। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) সেই মহিলার নিকট যান এবং হযরত উমর (রা.) সেই মহিলার স্বামীর কাছে গিয়ে বসে পড়েন। তার স্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তাঁকে চিনত না। তিনি (রা.) তার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। সেই মহিলা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সঙ্গীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন। অর্থাৎ সেই মহিলার স্বামীকে এই সুসংবাদ দিন যে, পুত্র সন্তান হয়েছে। সেই

ব্যক্তি হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর এই কথা শুনে বুঝতে পারে যে, সে কত মহান ব্যক্তির সাথে বসে ছিল, কেননা সে জানত না যে, কার সাথে বসে আছে! অতঃপর সে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি (রা.) বলেন, কোন সমস্যা নেই। এরপর তিনি (রা.) তাদেরকে অর্থ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন আর ফিরে আসেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব এবং হযরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! হযরত উমর (রা.) যা কিছু বলেছেন তা রক্ষা করেছেন। কঠোরতার স্থানে কঠোরতায় ও নম্রতার স্থানে নম্রতায় তিনি এগিয়ে যান এবং মানুষের সন্তানসন্ততির পিতা হয়ে যান। এমনকি তিনি সেসব মহিলাদের কাছে যেতেন যাদের স্বামীরা বাহিরে অবস্থান করত। তাদের বাড়ির দরজায় গিয়ে তাদেরকে সালাম দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? বা তোমরা প্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত্র আনাতে চাইলে আমি তা বাজার থেকে তোমাদেরকে কিনে এনে দিচ্ছি। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে প্রতারণা করা হবে– এটি আমি অপছন্দ করি। তখন সেসব মহিলা তাঁর সাথে তাদের ছেলে-মেয়েদের (বাজারে) পাঠিয়ে দিত। তিনি (রা.) যখন বাজারে যেতেন তখন তাঁর সাথে মানুষের ছেলে-মেয়েরা এত বেশি সংখ্যায় থাকত যে, তাদেরকে গণনা করাই কঠিন হয়ে যেত। এরপর (বাজারে গিয়ে) তিনি প্রত্যেকের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতেন আর যেসব মহিলার কোন সন্তান ছিল না, তাদের জন্য তিনি নিজেই বাজার করে আনতেন।

যখন কোন অভিযানে প্রেরিত সৈন্যদল থেকে কোন দূত (বার্তাবাহক) আসত তখন তিনি তার কাছ থেকে সেই মহিলাদের স্বামীদের প্রেরিত চিঠিপত্র নিয়ে স্বয়ং তাদের নিকট পৌঁছে দিতেন আর তাদেরকে বলতেন, তোমাদের স্বামী আল্লাহ্‌ তা'লার রাস্তায় গিয়েছে আর তোমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর শহরে বসবাস করছ। এই পত্র পড়ার মতো কোন ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে ভালো কথা, নতুবা দরজার কাছে এসে দাঁড়াও, আমি নিজেই পড়ে শুনাচ্ছি। এরপর বলতেন আমাদের দূত (বার্তাবাহক) এখান থেকে অমুক অমুক দিন যাবে, তোমরা চিঠি লিখে দিও যেন আমি তোমাদের চিঠিপত্র পাঠিয়ে দিতে পারি। এরপর তিনি (রা.) সেই মহিলাদের কাছে চিঠি লেখার কাগজ ও দোয়াত ইত্যাদি নিয়ে যেতেন এবং তাদের মধ্যে যারা চিঠি লিখে দিত তাদের চিঠি নিতেন আর যারা চিঠি লিখতে পারত না তাদেরকে বলতেন, এই হচ্ছে কাগজ ও দোয়াত, দরজার কাছে আস আর আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নাও। এভাবে তিনি (রা.) এক একটি বাড়ির দরজায় যেতেন আর তাদের পক্ষ থেকে তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে দিতেন এবং সেগুলোকে তাদের স্বামীদের কাছে প্রেরণ করতেন।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি দেখলাম হযরত উমর (রা.) উটের গদি কাঁধে নিয়ে 'আবতা'-র দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। এই 'আবতা' মক্কা ও মিনা-র নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। হযরত আলী বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তখন তিনি (রা.) বলেন, সদকার একটি উট হারিয়ে গেছে, আমি তার সন্ধানে যাচ্ছি। আমি হযরত উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম, আপনি আপনার পরে আগমনকারী খলীফাগণের জন্য এমন পথ নির্ধারণ করেছেন, এমন সব বিষয় সম্পাদন করছেন, যার উপর চলা সহজ কাজ নয়। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আবুল হাসান! আমাকে তিরস্কার করো না। মুহাম্মদ (সা.)-কে যিনি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় (সদকার) একটি ছাগলের বাচ্চাও হারিয়ে যায় তাহলে কিয়ামত দিবসে উমর সেই ছাগলছানার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একবার একজন মুসলমান মাথা নীচু করে হেঁটে আসছিল। অর্থাৎ এক মুসলমান ব্যক্তি মাথা নীচু করে

হাঁটছিল। হয়ত সে কোন কষ্ট বা কোন আঘাত পেয়েছিল যার কারণে সে উদ্বিগ্ন ছিল আর তাই মাথা নীচু করে হেঁটে আসছিল। হযরত উমর (রা.) তার চিবুকে একটি ঘুষি মারেন এবং বলেন, এখন ইসলামের বিজয়ের যুগ আর তুমি তোমার মাথা নীচু করে হাঁটছ! অর্থাৎ এখন সেই যুগ যখন ইসলামের বিজয় হচ্ছে, তোমার যদি সামান্য কষ্টও হয়ে থাকে তার জন্য তুমি নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলেছ আর মাথা নীচু করে হাঁটছ, এটি সঙ্গত কোন রীতি নয়। খোদা তা'লা এই যুগে ইসলামকে রাজত্ব দান করেছেন; জগত যা-ই বলুক, কিন্তু তুমি তো এই বিশ্বাস রাখ যে, ইসলামের বিজয় হবে। যদি তুমি এই বিশ্বাস রাখ যে, ইসলাম বিজয় লাভ করবে তাহলে কাঁদার তো কোন যুক্তি নেই? ছোট ছোট বিষয়ে ক্রন্দন করার কোন প্রয়োজন নেই। কোন জায়গায় যদি মুসলমানদের ক্ষতিও হয় তাতেও ক্রন্দন করার ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। এই কথাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে হিজরতের প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন। তিনি (রা.) আরো বলেছিলেন, এক মু'মিনের এটি দেখা উচিত নয় যে, সে কী হারিয়েছে। যদি কোন জিনিস নষ্টও হয়ে গিয়ে থাকে, কিছুটা ক্ষতিও যদি হয়ে থাকে তবুও এটি দেখা উচিত নয় যে, কী হরিয়েছে, বরং এটি দেখা উচিত যে, কার জন্য হারিয়েছে। যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, হস্তচ্যুত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আরো উত্তম প্রতিদান দিবেন। সাময়িক ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত হতে হয় না।

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, যদিও হযরত উমর (রা.)-কে কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি (রা.) সেই কষ্টের কোন পরোয়া করেন নি এবং তিনি (রা.) সেই সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যা ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেই ঘটনা হলো, জাবালা ইবনে আয়হাম খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী এক বড় গোত্রের নেতা ছিল। সিরিয়ার দিকে মুসলমানরা যখন অগ্রাভিযান শুরু করে, তখন সে নিজ গোত্রসহ মুসলমান হয়ে যায় এবং হজ্জের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। হজ্জের এক জায়গায় অনেক ভিড় ছিল। ঘটনাক্রমে কোন মুসলমানের পা তার পায়ে গিয়ে পড়ে। কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, দৈবক্রমে সেই দরিদ্র মুসলমানের পা তার জুব্বার কিনারায় পড়ে। যেহেতু সে নিজেকে একজন বাদশাহ মনে করত এবং তার ধারণা ছিল যে, আমার জাতির ষাট হাজার ব্যক্তি আমার আদেশের অনুবর্তী, বরং কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনানুসারে কেবল তার সৈন্য সংখ্যাই ছিল ষাট হাজার। যাহোক, যখন এক দরিদ্র মুসলমানের পা তার পায়ের ওপর পড়ে তখন সে ক্রোধবশত তাকে চড় মারে এবং বলে, তুই আমার অসম্মান করলি, তুই কি জানিস না আমি কে! শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তোর পেছনে সরে যাওয়া উচিত ছিল। তুই বেয়াদবি করে আমার পায়ে পা রেখেছিস। সেই হতদরিদ্র মুসলিম ব্যক্তি চড় খেয়ে নীরব থাকে, কিন্তু অন্য এক মুসলিম ব্যক্তি বলে উঠে, তুমি কি জান! যে ধর্মে তুমি প্রবেশ করেছ সেই ধর্মের নাম ইসলাম। আর ইসলাম ধর্মে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। বিশেষত এই গৃহে অর্থাৎ খানা কা'বায়, যেটির তুমি তাওয়াফ করছ, এখানে ধনী-দরিদ্র কোন ভেদাভেদ করা হয় না। সে বলল, আমি এসবের পরোয়া করি না। সেই মুসলমান বলেন, উমরের কাছে তোমার বিষয়ে নালিশ করা হলে তিনি উক্ত মুসলমানের সাথে কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবেন। জাবালা ইবনে আয়হাম এ কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং বলে, জাবালা বিন আয়হামের মুখে চড় মারার মতো কেউ কি আছে? সেই মুসলিম ব্যক্তি বলেন, অন্যদের কথা তো আমার জানা নেই তবে উমর (রা.) নিশ্চিতরূপে এরূপই। এ কথা শুনে সে দ্রুত তাওয়াফ শেষ করে এবং সোজা হযরত উমর (রা.)-এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয় আর তাঁকে (রা.) জিজ্ঞেস করে, কোন বড় মাপের মানুষ যদি কোন দরিদ্র মানুষের মুখে চড় মারে তাহলে আপনি কী প্রতিক্রিয়া দেখান? তিনি (রা.) বলেন, আমি যা করি তা হলো, সেই ব্যক্তির মুখে

উক্ত দরিদ্র মানুষ দ্বারা চড় মারিয়ে থাকি। সে বলল, আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি, আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, যদি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি চড় মারে তাহলে আপনি (তার সাথে) কী করেন? তিনি (রা.) বলেন, ইসলামে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। অতঃপর তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এই কাজ তুমি করো নি তো? তখন সে মিথ্যা বলে। সে বলল, আমি তো কাউকে চড় মারি নি, আমি কেবল একটি বিষয় জানতে চেয়েছি, এ কথা বলেই সে উক্ত বৈঠক থেকে উঠে পড়ে এবং নিজ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নিজ দেশে চম্পট দেয়। অতঃপর তার পুরো জাতিসহ সে মুর্তাদ হয়ে যায় আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানবাহিনীর অংশ হয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

ইসলামী রাষ্ট্র এমনই সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে আর বর্তমান ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। প্রথমে যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব, যিনি জার্মানির ওয়াইলডার্স হোস্ট জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সুইজারল্যান্ডের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক সদর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়তও ছিলেন। তিনি গত ১২ মে তারিখে মাউন্ট এভারেস্টে সফলতার সাথে আরোহন এবং সেখানে আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করার পর অবতরনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে বিধবা স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে, এছাড়া তার পিতামাতা এবং এক ভাই ও দুই বোন রয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের আমীর তারেক আল-মুদাস্‌সের সাহেব লিখেন, আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আমৃত্যু জামা'তের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জামা'তের একজন সাধারণ সদস্য ও কর্মকর্তা হিসেবে মরহুম একজন আদর্শ আহমদী ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব সর্বদা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জামা'তী দায়িত্ব পালন করতেন। তার চরিত্রে অহংকার বা দাম্ভিকতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি মানবসেবার শুধু উপদেশই দিতেন না, বরং নিজের আদর্শে তা ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি IAAAE এর বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে আফ্রিকায়ও গিয়েছেন এবং সেখানে মানবসেবা করেছেন, যা দেখে আরো অনেক যুবক তার আদর্শ অনুসরণে আফ্রিকা গিয়েছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত হবার পর নিত্যনতুন সুযোগের সন্ধানে থাকতেন যদ্বারা যুবকদের তালীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা হতে পারে এবং তাদেরকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও আকর্ষণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তার আর্থিক কুরবানীও আদর্শস্থানীয় ছিল।

তার পুত্র স্নেহের তালহা ওড়ায়েচ বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে পড়াশোনা করছে। আমীর সাহেবই লিখেছেন যে, তিনি সন্তানের উত্তম তরবিয়ত দিয়েছেন। এর ফলেই তার ছেলে এখন জামেয়ায় পড়াশোনা করছে। এক কথায় বলা যায়, মরহুম আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আল্লাহ্ তা'লা ও মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ আহমদী ছিলেন। তার মৃত্যুতে অ-আহমদীরাও অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছে। জনাব স্টিফেন লর্ড সাহেব লিখেন যে, ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব তার সাথে 'সুইস কম' কোম্পানীতে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন, যা সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী; এবং প্রায় এক বছর তার সাথে তার টীমে আমি কাজ করেছি। আমি শুধু তার পেশায় দক্ষতার কারণেই (তাকে) সম্মান করতাম না, বরং বিশেষভাবে তার আচরণের জন্যও (সম্মান করতাম)। ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব সর্বদা সদাচরণ করতেন। তিনি পরোপকারী, সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কাজের বাইরেও তার সাথে গল্প করতে আমার অনেক ভালো লাগতো।

মুরব্বী সাহেব লিখেন, তিনি অত্যন্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখতেন। রীতিমতো মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করতেন এবং অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযও মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল রিযওয়ান সাহেব বলেন, তিনি মাইক্রোসফট কোম্পানীর সুইজারল্যান্ডভিত্তিক শাখায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করছিলেন। একবার আমাকে বলেন যে, মাইক্রোসফট সুইজারল্যান্ডভিত্তিক শাখা বন্ধ করে সিলিকন ভ্যালীতে স্থানান্তর করছে। তারা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে যে, আমাদের সাথে চলুন; সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং বেতনও বৃদ্ধি পাবে আর সুইজারল্যান্ড থেকে আপনার সমস্ত আসবাবপত্র আমরাই স্থানান্তর করব। তিনি বলেন, আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি, কেননা এখানে আমার ওপর বিভিন্ন জামা'তী দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এখানকার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সেখানে চলে যাব– এটি আমি চাই না। এর কিছুদিন পর তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে এই শাখাকে সুইজারল্যান্ডের একটি বড় কোম্পানী 'সুইস কম' ক্রয় করে নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারা তো আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখানেই আমার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, বরং আল্লাহ্ তা'লার এরূপ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে যে, এখানে আমার বেতন আমার বসের (বেতনের) চেয়েও বেশি।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে খারেজা জাহেদ সাহেব বলেন, ২৬ বছর যাবৎ আমি তাকে জানতাম। খোদ্দামুল আহমদীয়ায় থাকাকালীন তার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খুবই ভদ্র, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, দোয়ায় অভ্যস্ত, কঠোর পরিশ্রমী, খিলাফতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান, স্নেহপরায়ণ বন্ধু আর মিশুক মানুষ ছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তিনি অন্যান্য যুবকের চেয়ে পৃথক প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। কখনো তাকে রাগান্বিত হতে দেখি নি আর তার চেহারায়ও কখনো এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি নি বা তার কথায়ও অনুভব করি নি। কখনো উচ্চস্বরে বা কঠোর ভাষায় কথা বলতে দেখি নি। আমাদের ভুল হলে সবসময় পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে কোমলতার সাথে বুঝিয়ে দিতেন। ছোট-বড় সবার সাথে সর্বদা হাস্য-বদনে ভদ্রতার সাথে কথা বলতেন। হালকা মুচকি হাসি তার চেহারায় লেগে থাকত। প্রাণ, সম্পদ, সময় ও মান-সম্মান উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। সুইজারল্যান্ডের বহু যুবক এমন রয়েছে যাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি শুধু দিক-নির্দেশনাই প্রদান করেন নি, বরং তাদের অনেককেই আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে তিনি আহমদীয়া হাইকিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু যুবককে হাইকিং সম্পর্কে অবগত করেন। অসাধারণ দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। (জাহেদ সাহেব) বলেন, আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করি যে, হাইকিং করতে আপনার কোন ভয় হয় না? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ হয়, আর আমার পরিবারও এটি অপছন্দ করত, কিন্তু আমি এর যে সমাধান বের করেছি তা হলো, আমি যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করি, অর্থাৎ আমার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন, আর তাঁর সামনে এই প্রস্তাব রাখার চিন্তা করি যে, যদি তিনি অনুমতি দেন, (অর্থাৎ) যদি আমার পক্ষ থেকে তিনি অনুমতি পেয়ে যান, তিনি বলেন, তাহলে আমি সংকল্প করেছি, সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করে সেগুলোর ওপর আহমদীয়াতের পতাকা উড়াব। তিনি বলেন, তার শঙ্কা ছিল, আমি কোথাও তাকে নিষেধ না করে দেই, কিন্তু আমি তাকে বলি যে, যদি যেতে পার তাহলে পতাকা গেড়ে দাও। তিনি বলেন, এখন আমি তা-ই করব, ইনশাআল্লাহ্। এরপর এই যুবক আর কখনো পেছনে ফিরে তাকান নি আর এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং একের পর এক পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে থাকেন। মরহুম পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টেও আহমদীয়াতের পতাকা উড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। লেখক লিখেছেন যে, আমি জানি

না তার মৃত্যুকে শাহাদাত বলা যায় কিনা, তবে নিজ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, মরহুমের মাঝে ঈমানের সেই স্পৃহা ছিল যা এমন পুণ্যবান লোকেরাই লাভ করে যারা শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষী থাকে। তবে আমার মতে তিনি নিশ্চিতভাবে এক সৎ উদ্দেশ্য এবং প্রেরণার সাথে ইসলাম, আহমদীয়াত এবং খোদা তা'লার তওহীদের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন আর তাতে সফলও হয়েছেন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের সফরে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে গেছেন। তিনি নিশ্চিতরূপে শহীদের মর্যাদা পেয়ে থাকবেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

তার পিতা মোহতরম খাদেম হোসেন ওড়ায়েচ সাহেব বলেন, আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে, আমাদের এই পুত্র সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আর একের পর এক পাহাড়ে আরোহন করছে। সে আর পেছনে ফিরে তাকায় নি। আমার বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করত যে, আপনি তাকে বাধা দেন না কেন? এটি অত্যন্ত বিপদজনক একটি শখ। আমি উত্তর দিতাম, আমি বাধা দিলেও সে বিরত হবে না, কেননা তার ভেতরে একটি প্রেরণা কাজ করছে যে, আমি জামা'তের পতাকা পৃথিবীর সমস্ত উঁচু স্থানে উড়াব, আর আল্লাহ তা'লার তওহীদের বাণী পৌঁছাব।

এক বন্ধু লিখেছেন, আমি একবার সদর সাহেবকে প্রশ্ন করলাম যে, আপনি যখন পাহাড়ে আরোহন করেন তখন নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য মোবাইলে কি শুনেন? সদর সাহেব আমাকে উত্তর দেন যে, আমি হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ ডাউনলোড করেছি আর সফরে সেগুলো শুনি। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে আরেকবার আমি সদর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, এত উচ্চতায় এবং ঠাণ্ডায় আপনি ইবাদত করেন কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, মুরব্বী সাহেব! পাহাড়ের চূড়ায় ইবাদত করতে আমার খুবই ভালো লাগে। আমার হৃদয়ে এ ধারণা জাগে যে, আল্লাহ্ তা'লার নবীরাও পাহাড়ের নির্জনে জগতের হট্টগোল থেকে দূরে গিয়ে ইবাদত করতেন। তিনি বলেন, আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আমাকে একবার এক সফরের ঘটনা শুনান যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল পাহাড় অর্থাৎ উত্তর আলাস্কার দিনালী পাহাড় চড়ার সময় তার তর্জনী ঠাণ্ডায় জমে যায় ও ইনফেক্শন হয়ে যায়। তিনি যখন ডাক্তারকে সেই ক্ষত দেখান তখন ডাক্তার বলেন, এটি একেবারেই জমে গিয়েছে আর শরীরের অংশ নেই, এটি অকেজো হয়ে গেছে, সুতরাং এটিকে জরুরীভিত্তিতে কেটে ফেলে দিতে হবে। সদর সাহেব উত্তরে বলেন, এটি তর্জনী, এর মাধ্যমে আমরা নামাযে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করি, তাই এই আঙুল আমি কোনভাবেই কাটাব না। এরপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন আর যা ঘটেছে তা হলো, দোয়ার কল্যাণে সেই আঙুল সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তাঁর পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। তার যেসব গুণাবলী মানুষ বর্ণনা করেছে এবং আমিও তার মাঝে দেখেছি, তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি সেসব গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন। খিলাফতের প্রতিটি নির্দেশে সাড়া দিতেন, শুধু মৌখিক দাবি নয় বরং বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠায় অগ্রগামী ছিলেন এবং আরো অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা চলে গেলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ধর্ম এবং তাঁর একত্ববাদের পতাকা প্রত্যেক উঁচু স্থানে প্রোথিত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল, যাতে তিনি সফল হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো মোহতরমা আমাতুন নূর সাহেবার, যিনি ডাক্তার আব্দুল মালেক শামীম সাহেবের স্ত্রী এবং সাহেবযাদী আমাতুর রশীদ বেগম ও মিয়া আব্দুর রহীম সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ১৫ জুন ওয়াশিংটনে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রদৌহিত্রী এবং নানার দিক থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এরও প্রদৌহিত্রী ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাই সাহেবার দৌহিত্রী আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী বিহারের প্রফেসর হযরত আলী আহমদ সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তার স্বামী হলেন মৌলভী আব্দুল বাকি সাহেবের পুত্র ডাক্তার আব্দুল মালেক শামীম সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দু'টি কন্যা সন্তান দান করেছেন। তাদের বিয়ের খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পবিত্র কুরআনের নির্ধারিত আয়াতসমূহ পাঠের পর বলেন, নিকাহ্র ঘোষণার সময় যে আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, এগুলোর মাঝে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও রয়েছে যে, কর্মের সংশোধনের জন্য সহজসরল বক্রতামুক্ত কথা বলা আবশ্যক। অধিকাংশ দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা অপকর্মের ফলেই সৃষ্টি হয়। আর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপকর্মের মূল কারণ হলো, সহজসরল বক্রতামুক্ত কথা না বলা। যদি স্পষ্ট ও সোজাসরল মু'মিনসুলভ কথা বলা হয় তাহলে কোন ধরনের ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না আর কোন ধরনের অপ্রীতিকর বিষয় ও দুশ্চিন্তার আশঙ্কা থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের তৌফিক দান করুন এবং আমাদের সবার কর্মের সংশোধনের উপকরণ সৃষ্টি করুন আর আমাদের মাঝে যেন সত্য কথা বলার এমন অভ্যাস গড়ে উঠে যা আমাদের একটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। সেখানে তাঁর নিকাহ্র সাথে আরো পাঁচ-ছয়টি বিয়ে হয়েছিল। তাদের বিয়ের ব্যাপারে তিনি (রাহে.) বলেন, এ বিয়েগুলোর একটি সম্পর্কের দিক থেকে এবং ভালোবাসার সম্পর্কের নিরিখে আমার নিজ মেয়েরই বিয়ে। এই মেয়ে মিয়া আব্দুর রহীম সাহেব ও আমার ছোট বোন আমাতুর রশীদ বেগমের কন্যা আমাতুন্ নূর, যার বিবাহ মৌলভী আব্দুল বাকী সাহেবের ছেলে ডক্টর আব্দুল মালিক শামীমের সাথে হচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া থাকবে, এই সম্পর্ক এবং বাকি সম্পর্কগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় প্রভূত সুখের ও আনন্দের উত্তরাধিকারী করুন। এরপর তিনি বিয়ের উভয়পক্ষ ও আহমদীয়াতকে সামনে রেখে বলেন, ইসলামের কল্যাণ কামনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এক সুদীর্ঘ চেষ্টা-সংগ্রামের পর আহমদীয়াত ইসলামের বিজয়ের ক্ষেত্রে শেষ এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে। এজন্য প্রজন্ম পরম্পরায় সঠিক তরবিয়ত লাভ এবং সুস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা মানুষের সাথে না থাকে তবে মানুষের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ, অনর্থক ও নিষ্ফল হয়। অতএব, আমরা দোয়া করি, এসব বিয়ে এবং জামা'তের মধ্যে যেসব বিয়ে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেসব বিয়ের ফলেও যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইসলামের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের উপকরণ সৃষ্টি হয়।

সাহেবযাদী আমাতুন্ নূর সাহেবা জামা'তের কাজ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও ন্যাশনাল নায়েব সদর ছিলেন। এছাড়া ওয়াশিংটনের স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার বড় কন্যা আমাতুল মুজীব বলেন, তিনি সর্বদা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীলা ছিলেন। কাউকে সাহায্য করা সম্ভব হলে আম্মা অসাধারণভাবে সাহায্য করতেন। নিজের ইবাদতের বিষয়ে খুবই যত্নশীল ছিলেন। তিনি বলেন, পাঁচবেলার নামায ছাড়াও প্রতিদিনই রাতে যখনই আমি সজাগ হয়েছি তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। আমাতুন্ নূর সাহেবার স্বামী অনেক দিন আগেই এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তার মেয়ে বলেন, আমাদের পিতার মৃত্যুর পর (আম্মা) বিশ বছর বৈধব্য কাটিয়েছেন। এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। কৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষণীয়। তিনি বলতেন, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি ও দয়া অপরিসীম। তিনি বলেন, আমি তাকে সর্বদা একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি আরও বাড়িয়ে দিব, তাই সর্বদা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উদারমনা হওয়া এবং হৃদয়কে প্রশস্ত রাখা, অতিথিসেবা করা, মানুষের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুণাবলী তার মাঝে অনেক বেশি ছিল। তিনি বলেন, আমি আমার মায়ের মুখে অগণিতবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য শুনেছি যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ এটি নয় যে, কেউ তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চললে বিনিময়ে তুমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হলো, তোমার সাথে কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক (বজায়) রাখবে। আমি আমার মায়ের মাঝে তার সব আত্মীয়তার গণ্ডিতে এ গুণ দেখেছি, সবার ভালোগুণ অনুসন্ধান করতেন। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় এবং জামা'তের লোকজন এবং প্রতিবেশীদের প্রতিও একান্ত যত্নবান ছিলেন। নতুন কোন অতিথি মসজিদে আসলে তাকে খুঁজতেন, এরপর তার সাথে বসে কথা বলতেন এবং তাকে স্বাগত জানাতেন। অনেকেই লিখেছেন, তিনি স্নেহশীলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার অন্য কন্যাও লিখেছেন যে, জামা'তের লোকদের, বিশেষত নবদীক্ষিতাদের সাথে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মানুষও তাকে খুব ভালোবাসত। প্রত্যেককে তিনি সাহায্য করতে চাইতেন। এই চিন্তায় থাকতেন যে, কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তার কোন অভাব থাকবে আর তিনি সেটা পূর্ণ করতে পারবেন না- এমনটি যেন না হয়।

আমাতুন্ নূর সাহেবার বড় বোন আমাতুল বসীর সাহেবা লিখেন, সিস্টার শাকুরা নামী একজন আফ্রো-আমেরিকান মহিলা ছিলেন। তিনি যখন হজ্জ করতে যান তখন স্বপ্নে দেখেন, নওশী-র ঘর অর্থাৎ আমাতুন্ নূর সাহেবার ঘর (তাকে বাড়িতে নওশী বলে ডাকা হতো) মক্কায় অবস্থিত। সিস্টার শাকুরা যখন তার কাছে আসেন তখন তিনি বলেন, আমি আপনার যে সেবা করছি এর অর্থ হলো, আপনি আমার কাছে এসে গেছেন। তার বোন আমাতুল বসীর সাহেবা লিখেন, আফ্রিকান-আমেরিকান সিস্টার শাকুরা আঠারো বছর নওশীর কাছে ছিলেন। (এর মধ্যে) আট বছর পুরো শয্যাশায়ী ছিলেন, দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছিল এবং নওশী তার অনেক সেবা-যত্ন করেছে। তাকে নামাযও সে-ই পড়াতো, কারণ তিনি ভুলে যেতেন।

(হুযূর বলেন,) আমিও দেখেছি, তিনি সিস্টার শাকুরার অনেক সেবাযত্ন করতেন। আমি যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম তখন নিজেই তাকে হুইল-চেয়ারে বসিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে এসেছিলেন, আর সিস্টার শাকুরাও তার সেবাযত্নের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তবলীগ করার আগ্রহ ছিল, কোন না কোন উপায়ে জামা'ত সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করতেন। কেউ যদি প্রশ্ন করত, পাকিস্তানের কোন স্থান থেকে এসেছেন? তবে সবসময় উত্তরে রাবওয়ার নাম উল্লেখ করতেন, আর এভাবে আলোচনা শুরু হয়ে যেত। ইহুদি ধর্মাবলম্বী একটি পরিবারের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই পরিবারের এক ভদ্রমহিলার নাম রুকাইয়্যা আসাদ; তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল আমেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাতুন্ নূর সাহেবা অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছে। যে-ই তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছে, তারা সবাই তার গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে। তিনি কার্যত নিজের জীবন ইসলাম-আহমদীয়াতের শিক্ষানুসারে যাপন করেছেন, যার ফলে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হতো; আর তিনি মানুষের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বাস্তব আদর্শ ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকে লাজনাদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সর্বদা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। ধৈর্য, অবিচলতা ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে নিজের সমস্যাবলী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মোকাবিলা করেছেন, আর এদিক থেকে তিনি অন্যদের জন্য (অনুকরণীয়) আদর্শ ছিলেন। ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নতুন অতিথিদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে ছিলেন। তরুণ এবং বার্ধক্যে উপনীত উভয় শ্রেণীর নারীদের জন্যই তিনি উত্তম আদর্শ ছিলেন। এই ভদ্রমহিলা

লিখেন, আমার বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি আমার হৃদয়ে তার জন্য শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি আরও লিখেন, আমরা মুখে বলি যে, আমাদের খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা করা উচিত, দরিদ্র ও অভাবীদের খেয়াল রাখা উচিত; অথচ এক্ষেত্রে নওশী খালা অনাত্মীয় সদস্যদের সেবায় বছরের পর বছর নিজের ব্যক্তিগত সময়ও উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ নিজের জন্য কোন ব্যক্তিগত সময় রাখেন নি, (মানুষের) সেবায় রত থাকতেন। একইভাবে আরও কয়েকজন আহমদী মহিলা, বিশেষত আফ্রো-আমেরিকান ভদ্রমহিলারা লিখেছেন যে, আমাদের সাথে তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদেরকে অনেক কিছু অবহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও সর্বদা তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। (হুযূর বলেন,) আমি তো এটাই দেখেছি যে, তিনি খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন; আমার প্রতিও তাকে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করতে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, শ্রদ্ধেয়া বিসমিল্লাহ্ বেগম সাহেবার, যিনি হিফাযতে খাস-এর (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্‌র নিরাপত্তা বাহিনীর) সাবেক কর্মকর্তা জনাব নাসের আহমদ খান সাহেব বাহাদুর শের-এর সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি গত ১৪ জুন তারিখে জার্মানীতে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতা হযরত চৌধুরী মাযহারুল হক খান সাহেব কাঠগড়ী'র মাধ্যমে। কাদিয়ানের বোর্ডিং স্কুলেও তিনি কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে নিজের একটি কুর্তা বা জামাও উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। মরহুমা পাঁচ কন্যা ও দু'জন পুত্র রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মাহমুদ আহমদ সাহেব ফিজিতে মুরব্বী সিলসিলা ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত আছেন, তিনি (সেই) জামা'তের আমীরও বটে। তিনি অর্থাৎ আমাদের মুবাল্লেগ মাহমুদ আহমদ সাহেব লিখেন, শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুর পর জমিজমা থেকে যে আয়-উপার্জন হতো, তা থেকে সর্বপ্রথম তিনি চাঁদা প্রদান করতেন। পিতার পেনশনের টাকা সঞ্চয় করতেন এবং কোন কাজেই ব্যয় করতেন না। তিনি এই টাকায় দক্ষিণ তাহেরাবাদে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি আমাদেরকে সর্বদা নসীহত করেছেন যে, খিলাফতের আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখবে। এরপর তিনি লিখেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি একাই আমাদের সবাইকে মা-বাবা উভয়ের ভালোবাসা দিয়েছেন। তিনি কখনো আমাদেরকে পিতার অভাব বুঝতে দেননি। আমি তখন জামেয়া আহমদীয়ার প্রথম বর্ষে ছিলাম, তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, তুমি ধর্মের সৈনিক, তোমাকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছি, কাজেই যুগ খলীফা যেখানে দাঁড়াতে বলবেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমৃত্যু তিনি এমন কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি লিখেন, প্রথমদিকে শুধু আমার পিতাই আমাদের গ্রাম থেকে রাবওয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। প্রায়ই আমাদের আত্মীয়-স্বজন গ্রাম থেকে রাবওয়ায় আসতেন। তিনি সানন্দে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং সম্মানজনকভাবে সাধ্যাতীত আতিথেয়তা করতেন। প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখা তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন। আমার সহপাঠীদের সবসময় নিজ সন্তানতুল্য জ্ঞান করেছেন। ছাত্রাবাসে যেসব বিদেশী ছাত্র থাকত, তিনি প্রায়ই তাদেরকে (আমাদের) বাড়িতে নিয়ে যেতে বলতেন, যেন তাদের জামেয়াতে মন বসে যায়। জামেয়ার অধিকাংশ ছাত্র আমার মায়ের স্নেহ পেয়েছে, অনেক মুবাল্লেগ এর সাক্ষী। পাকিস্তান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকান ছাত্ররাও (আমার) মায়ের এই স্নেহ পেয়েছে। তিনি বলেন, তার কাছে যত টাকা থাকত সব বিলিয়ে দিতেন বা চাঁদা দিয়ে দিতেন, কিন্তু এগুলো তার কাছে রেখে দেয়ার কথা বলার সাহস কারো ছিল না। আমি যেমনটি বলেছি, মুরব্বী সাহেব ফিজির আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত আছেন, তাই তিনি জানাযায় অংশ নিতে পারেন

নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মানসিক প্রশান্তি দান করুন। মরহুমার অন্য সন্তানদেরও ধৈর্য ধারণের এবং তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো কর্নেল জাভেদ রুশদী সাহেবের, যিনি রাওয়ালপিণ্ডি নিবাসী চৌধুরী আবদুল গনী রুশদী সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর পুরো সময় তিনি জামা'তের সেবায় রত ছিলেন। তিনি সেক্রেটারী তা'লীম, সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ, সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা ছাড়াও (নিজ) হালকার সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনবার রাওয়ালপিণ্ডির স্যাটেলাইট টাউন হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অত্যন্ত দোয়াগো মানুষ ছিলেন। নীরবে মানুষকে আর্থিক সাহায্য করতেন। সহানুভূতিশীল মনমানসিকতার অধিকারী ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোকদের বিপদাপদের সময় সর্বদা সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। একজন সুব্যবস্থাপক ও বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। নামাযান্তে তাদের সবার (গায়েবানা) জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।